কালের কণ্ঠ

মোশাররাফ হোসেন
মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া ▶

একীভূত শিক্ষা ও প্রতিবন্ধী শিশু

বিশ্বের ১০০ কোটিরও বেশি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৯ কোটি ৩০ লাখ প্রতিবন্ধী শিশু, যা মোট জনগোষ্ঠীর ৯ শতাংশ। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর চার ভাগের তিন ভাগই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, যার মধ্যে ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশুর বসবাস আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে। শিক্ষার অধিকার মৌলিক মানবাধিকার। যে শিশুটি এই মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত, সে সুস্থ আর স্বাভাবিকভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও রাষ্ট্রে তার অবস্থান হয় সবচেয়ে দুর্বল। এই দুর্বলতার দায়ভার আজন্ম শুধু তাকে নয়, বয়ে বেড়াতে হয় সমাজ ও রাষ্ট্রকেও। একজন প্রতিবন্ধী শিশুর ক্ষেত্রে এই 'অবস্থান' একজন সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর চেয়ে কতটুকু বৈষম্য, পীড়ন আর দুর্বিষহ হতে পারে, তা কেবল ভুক্তভোগীই ভালো জানেন। এই দায়ভার থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হতে পারে তাকে শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা। এ প্রক্রিয়ার সফল বাস্তবায়নে কার্যকর মহৌষধ হতে পারে একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম।

বাংলাদেশে এখনো অনেক শিশু আছে, যারা শারীরিক বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার, আর্থসামাজিকভাবে ঝুঁকিগ্রস্ততা, দরিদ্রতা, দুর্গম এলাকায় বসবাস, পথশিশু কিংবা ক্ষুদ্রজাতির শিশু হওয়ার কারণে বিদ্যালয়ে আসতে পারে না। এসব শিশুকে সাধারণ শিশুদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে একসঙ্গে একই শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা সময়ের দাবি। এরই মধ্যে এই কার্যক্রম শুরুও হয়েছে। এই একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় একই বিদ্যালয়ে সব শিক্ষার্থী থেকোনো ক্ষেত্রেই তাদের সক্ষমতা বা দুর্বলতা বিবেচনা না করেই, বিদ্যালয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সবাইকে সমানভাবে বিবেচনা করে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণত আমাদের পারিবারিক ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জীবন সম্পর্কিত ধারণার প্রাথমিক ধাপ থেকেই চারপাশের পরিমণ্ডল কিংবা অপরাপর সমবয়সীদের থেকে নিজেকে আলাদা ভাবতে শেখে; তবে ইতিবাচক মনোবৃত্তির দিক থেকে নয়, কেবলই অসহায়ত্বের দিক থেকে। এই অসহায়ত্ব সময়ের পরিক্রমায় প্রতিবন্ধী শিশুর নিজস্ব ভুবনে একটি একাকিত্বের বলয় তৈরি করে, যা তার স্বাভাবিক জীবনকে বাধাগ্রস্ত করে।

বাংলাদেশে ২০০৩ সালের বিশ্ব ব্যাংক জরিপ অনুযায়ী ৩৫ লাখ প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে, যা বর্তমানে ৪৫ লাখের ওপরে। কিন্তু গৃহীত পদক্ষেপগুলো যথাযথ বাস্তবায়িত না হওয়ায় আমাদের দেশে মোট প্রতিবন্ধী শিশুর মাত্র ১৪ শতাংশ স্কুলগামী হচ্ছে, যার মধ্যে বহু প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যাই বেশি। অনানুষ্ঠানিক একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে শিক্ষাদান পর্যায়ের কারো কারো মনে এখনো কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাঁরা মনে করেন, মাঝারি ও উচ্চমাত্রার প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা শুধু কাগজে-কলমে সম্ভব, বাস্তবে নয়। কিন্তু গবেষণায় প্রমাণিত, প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রায় ৬০ শতাংশ সামান্য বা কোনো পরিবর্তন ছাড়াই মূলধারার শিক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ২০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা নিতে পারে সামান্য অভিযোজনের মাধ্যমে। বাংলাদেশে সরকারি ও এনজিওর বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ২২ থেকে ২৫ হাজার শ্রবণ, দৃষ্টি ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশু পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এই বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগই বড় শহরে, যা অনেকাংশে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল। দেশের শিক্ষানীতি, আইনি কাঠামো যদিও একীভূত শিক্ষা সমর্থন করে, কিন্তু বাস্তবতা এখনো বহুদূর। তাই আমরা চাই একীভূত শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়ন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে একীভূত শিক্ষার

> আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, স্কুলগুলোতে বিদ্যমান সম্পদ, অবকাঠামো, শিক্ষক ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিক্ষাব্যবস্থার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন প্রধানত নীতিনির্ধারক ও শিক্ষক পর্যায় থেকে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ

অস্বীকার করেও আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বাস্তব চিত্র কী রূপ তা জরিপ, গবেষণা ও বাস্তবায়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার দাবি রাখে। আমার জীবনের সঙ্গে প্রতিবন্ধিতার সহবাস এবং বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দীর্ঘ ১৮ বছর প্রতিবন্ধী মানুষের সঙ্গে কাজ করার সুবাদে আমার মনে হয়, আমাদের দেশে একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নে এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। যেমন—একজন শিক্ষার্থী বাসস্থানের পর সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে তার বিদ্যালয়ে। অথচ এখন পর্যন্ত আমাদের সব বিদ্যালয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী র‍্যাম্প বা ঢালু সিঁড়ির ব্যবস্থা নেই টয়লেটগুলোতে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শেখার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন—ব্রেইল পদ্ধতি, ব্রেইল মুদ্রিত বই, টেপ রেকর্ডার, ক্যাসেট, রাইটিং ফ্রেম, ছবি ও অন্যান্য শিক্ষাসহায়ক উপকরণ অপরিহার্য হলেও আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে তা সচরাচর চোখে পড়ে না। প্রতিবন্ধী শিশুরা বিদ্যালয়ের প্রতিকূল পরিবেশ, পরিবার থেকে উৎসাহের অভাব, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভর্তি করার ক্ষেত্রে অনীহা—সর্বোপরি দরিদ্রতা এই বিপুলসংখ্যক শিশুকে বিদ্যালয়বিমুখ করে রেখেছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, স্কুলগুলোতে বিদ্যমান সম্পদ, অবকাঠামো, শিক্ষক ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিক্ষাব্যবস্থার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন প্রধানত নীতিনির্ধারক ও শিক্ষক পর্যায় থেকে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ। তা ছাড়া শ্রেণিকক্ষে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া এবং সহপাঠীরা যাতে তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করে, সে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করা, ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। শিক্ষকদের প্রতিবন্ধী শিশুদের পাঠদানের প্রক্রিয়ার ওপর যেমন ব্রেইল, ইশারা ভাষার ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষার ওপর নবতর ধ্যানধারণা, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা। সর্বোপরি প্রয়োজন প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি সবার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত জাতীয় ভূমিকা, সরকার জাতীয় নির্বাহী কমিটি, প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা পর্যবেক্ষণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভিন্ন বিভাগ চালু এবং জাতীয় শিক্ষা বোর্ড ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগ। তাহলেই কেবল সম্ভব বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে ভরপুর দেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন একটুকরো আলো। সম্ভব আজকের এই আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'বাঁধ ভাঙো, দুয়ার খোলো, একীভূত সমাজ গড়ো'—এই আহ্বানটির সঠিক বাস্তবায়ন।

লেখকদ্বয় : ভাস্টি ডিরেক্টর, এডিডি ইন্টারন্যাশনাল ও প্রশিক্ষক, সাংবাদিক ও সমাজকর্মী